ড্যান ব্রাউন : মার্কিন থ্রিলার লেখক ড্যানিয়েল গেরহার্ড ব্রাউনের জন্ম ১৯৬৪ সালের ২২ জুন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের এক্সিটারে। ড্যান ব্রাউন নামেই তিনি বিখ্যাত। তাঁর বাবা বিখ্যাত গণিত শিক্ষক রিচার্ড জি. ব্রাউন ফিলিপস এক্সিটার একাডেমিতে পড়াতেন। ড্যান এই একাডেমি থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। এরপর আমহার্স্ট কলেজ থেকে স্নাতক হন। ছোটবেলায় সংগীতের প্রতি ঝোঁক ছিল। ১৯৮৬ সালে পেশাদার সংগীতশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হন। ১৯৯৪ সালে সিডনি শেলডনের লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে ড্যান লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। ড্যান ব্রাউনের উপন্যাস *ডিজিটাল ফোরট্রেস* প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। সেটা তাঁর প্রথম লেখা। পাঠক বইটি সাদরে গ্রহণ করায় ড্যানকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ২০০৩ সালে প্রকাশিত *দ্য ডা ভিঞ্চি কোড* বিশ্বজুড়ে তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়।

ক্রিপ্টোগ্রাফি বা সাংকেতিক চিহ্নের রহস্যময়তা, কী, কোড এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোর সন্নিবেশ ড্যানের রচনাগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করেছে। রবার্ট ল্যাংডনের চরিত্রটিকে কেন্দ্রে রেখে তিনি দুঃসাহসিক সব অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর লেখায়। ড্যান ব্রাউনের বইসমূহ বিশ্বজোড়া থ্রিলার পাঠকদের জন্য সোনার খনি। তাঁর রচনায় বুঁদ হয়ে থাকা পাঠক সাংকেতিক রহস্যময়তার জন্য ড্যানের রচনার সমাদর করেন। ড্যান ব্রাউনের পাঠকনন্দিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে *ডিসেপশন পয়েন্ট*, *অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড ডেমনস*, *দ্য লস্ট সিম্বল*, '*ইনফার্নো* ও অরিজিন। তাঁর বই বিশ্বের ৫৫টির বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে; বিক্রি হয়েছে ২০০ মিলিয়নেরও বেশি কপি। এছাড়াও *অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড ডেমন্স*, *দ্য ডা ভিঞ্চি কোড* এবং *ইনফার্নো* পেয়েছে চলচ্চিত্ররূপ। ড্যান ব্রাউনের রচনা নিয়ে ধর্মতত্ত্ববিদেরা বিতর্ক তুলেছেন, তবে ড্যান তাঁর রচনাকে ধর্মের রহস্যময়তার একটা নতুন দিক হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

দ্য দা ভিঞ্চি কোড

ড্যান ব্রাউন

রূপান্তর

শেখ আবদুল হাকিম

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

আভাস

রাত ১০ : ৪৬
লুভর মিউজিয়াম, প্যারিস

লুভর মিউজিয়ামের ভেতর, গ্র্যান্ড গ্যালারির অসংখ্য তোরণশোভিত পথ ধরে, তিরবেগে ছুটছেন কিউরেটর জ্যাক সনিয়ে—তাঁকে যেন কোনো ভূত বা আততায়ী ধাওয়া করেছে। মুহূর্তের জন্য থেমে তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশটা দেখে নিলেন একবার, তারপর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা ক্যারোভাজ্জিওর একটা চিত্রকর্মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ কিউরেটর নিজেকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা মাথাতেই আনলেন না। দুহাত দিয়ে ছবির ফ্রেম আঁকড়ে ধরলেন, তারপর টান দিয়ে দেয়াল থেকে বের করে আনলেন ওটা। ভারসাম্য থাকল না, ছবিসহ মেঝেতে, একটা ক্যানভাসের নিচে পড়ে গেলেন বৃদ্ধ।

যেমনটি হওয়ার কথা, পিলে চমকানো বিকট আওয়াজ শুনতে পেলেন কিউরেটর। বুঝতে পারলেন লোহার বিশাল দরজাটা পড়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে লুভর মিউজিয়ামে ঢোকার মূল প্রবেশপথ। কয়েক সেকেন্ড পর একটা অ্যালার্ম বেজে উঠল দূরে। কিউরেটর উপলব্ধি করলেন, নকশা করা কাঠের মেঝে থরথর করে কাঁপছে তাঁর শরীরের নিচে। মেঝেতে স্থির পড়ে আছেন। বুক ভরে শ্বাস নিলেন একবার।

আমি বেঁচে আছি।

ক্রল করে ক্যানভাসের তলা থেকে বের হলেন, লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগলেন ব্যাকুল হয়ে। ঠিক তখন কথা বলে উঠল কেউ : 'নড়বেন না।'

ভয়ে হাত-পা জমে গেল কিউরেটরের। ধীরে ধীরে মাথাটা কাত করলেন তিনি।

মাত্র পনেরো ফুট দূরে, সিল করা দরজার বাইরে, সাদা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক। গরাদের ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে কিউরেটরকে দেখছে।

কিউরেটর খেয়াল করলেন আগন্তুকের মুখে দাড়ি আছে। মুখটা লম্বা, গায়ের রং ফকফকে সাদা আর চুলগুলো খুব পাতলা। চোখের মণি গোলাপি, চারপাশে গাঢ় লাল রঙের তিলের মতো কিছু দাগ। তবে সবার আগে যেটা চোখে পড়ে—আগন্তুকের পুরো শরীরে শ্বেতী।

কোটের পকেট থেকে পিস্তল বের করল আগন্তুক সরাসরি কিউরেটরের দিকে তাক করল। 'আপনি দৌড়াবেন না,' নির্দেশ দিল সে।

উচ্চারণ শুনে কিছু ঠাহর করতে পারলেন না বৃদ্ধ কিউরেটর।

'ওটা কোথায়?' প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'এ ব্যাপারে আগেই জানিয়েছি আপনাকে,' আত্মরক্ষার চেষ্টাই করলেন না কিউরেটর, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইছেন। 'কী বিষয়ে তথ্য চাইছেন বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার।'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন না,' বলল আগন্তুক, কিউরেটরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। চোখের মণি ছাড়া তাঁর শরীরের আর কিছু নড়ছে না। 'অধিকার নেই অথচ আপনি এবং আপনার ভাইয়েরা অনেক দিন ধরে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছেন জিনিসটা,' আবার বলল আগন্তুক।

কিউরেটরের পিঠ বেয়ে শিরশিরে শীতল অনুভূতি বয়ে গেল।

এটা সে জানল কী করে?

'যাঁরা ওটার আসল অভিভাবক, ঠিক তাঁদের কাছেই জিনিসটা ফেরত যাবে আজ। ওটা কোথায় আছে বলুন আমাকে। তথ্যটা পেলে প্রাণে বেঁচে যাবেন,' বলে ব্যারেলটা এবার সরাসরি কিউরেটরের মাথা বরাবর তাক করল আগন্তুক। 'এটা কি এমন কোনো গোপন জিনিস, যেটার জন্য আপনি মরতেও দ্বিধা করবেন না?'

সনিয়ের শ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

আগন্তুক লোকটা মাথা নাড়ল, তারপর বাড়িয়ে ধরা পিস্তলের কালো ব্যারেলের দিকে তাকাল একবার।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুললেন সনিয়ে। 'দাঁড়ান, তথ্যটা আপনাকে জানাব আমি।'

সাবধানে, ধীরে ধীরে শুরু করলেন কিউরেটর। কথা বলার সময় জীবনে কখনো এতটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আগন্তুককে যে মিথ্যে কথাটা বললেন, বহুবার সেটা একা একা অনুশীলন করেছেন তিনি। তবে মনে মনে সব সময় প্রার্থনা করেছেন—এই অনুশীলন যেন বাস্তবে কখনো ব্যবহার করতে না হয় তাঁকে।

সনিয়ের কথা শেষ হতেই বিচ্ছিরি শব্দে হেসে উঠল আগন্তুক। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। বাকি সবাইও ঠিক এ রকম তথ্যই দিয়েছেন আমাকে।'

হকচকিয়ে গেলেন কিউরেটর।

বাকি সবাই?

'তাঁদের সবাইকে খুঁজে পেয়েছি আমি,' বলল আগন্তুক, ভঙ্গিটা ব্যঙ্গাত্মক। 'বাকি তিনজনের সবাই কথা বলেছেন আমার সঙ্গে। এইমাত্র আপনি যা বললেন, তাঁরাও ঠিক এই একই কথা বলেছেন।'

এটা অসম্ভব। এ রকম কিছু হতে পারে না। কিউরেটরের পরিচয় তো অবশ্যই, সেই সঙ্গে তাঁর বাকি তিন সেনিচক্কের পরিচয়ও প্রায় ওই বিশেষ তথ্যটার মতোই চরম পর্যায়ের গোপনীয়, যেটা তাঁরা এত দিন ধরে আগলে রেখেছেন।

কী ঘটেছে, সেটা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেন বৃদ্ধ কিউরেটর। তিন ভাই সবাই এই একই কাজ করেছেন। মৃত্যুর আগে সযত্নে পরিকল্পিত মিথ্যে কথাটা জানিয়ে গেছেন আগন্তুককে। কিউরেটর বুঝলেন, তিন ভাইয়ের কেউই নির্দিষ্ট সেই প্রটোকল ভাঙেননি।

পিস্তলের দিকে আবার তাকাল আগন্তুক। 'আপনি মারা যাবেন। তখন তথ্যটা জানে এ রকম মানুষ আর মাত্র একজনই থাকবে পৃথিবীতে—আমি।'

এটা সেই ভয়ংকর সত্য।

মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারলেন কিউরেটর। তিনি যদি মারা যান তাহলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসল সত্যটাও চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। ব্যাপারটা যেন জ্যাক সনিয়ের ভেতর একটা সুইচ অন করে দিল। পরিবেশ-পরিস্থিতি ভুলে উঠে বসার চেষ্টা করলেন তিনি।

মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল আগন্তুকের পিস্তল। মাথায় বা বুকে নয়, কিউরেটরের পেটে গুলি করেছে সে। কিউরেটর অনুভব করলেন ক্ষতের জায়গাটা গরম হয়ে উঠছে। হঠাৎ সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি ... আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ব্যথা সহ্য করতে।

ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিচ্ছেন কিউরেটর, গরাদের ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। এবার কিউরেটরের মাথা বরাবর পিস্তল তাক করল লোকটা।

চোখ বন্ধ করলেন সনিয়ে। ভয় আর অনুশোচনা, দুটোই একসঙ্গে কাজ করছে তাঁর মনে।

পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল আগন্তুক।

ক্লিক!

খালি চেম্বারের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল করিডরজুড়ে।

কিউরেটর চোখ খুললেন।

পিস্তলের দিকে তাকিয়ে আছে আগন্তুক, বিস্মিত। দ্বিতীয় আরেকটা ক্লিপের জন্য পকেটে হাত ঢোকাল সে, তার পরই আবার সিদ্ধান্ত বদল করল। কিউরেটরের পেটের দিকে তাকিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে হাসছে। 'এখানে আমার কাজ শেষ।'

মাথা নিচু করলেন কিউরেটর, সাদা লিনেন শার্টের যেখানে বুলেট ঢুকেছে সেই গর্তটার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেখানে পাঁজরের হাড় থাকে, তার কয়েক ইঞ্চি নিচে, ফুটোটার চারপাশে রক্তের ছোট একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে।

আমার পেট।

কিউরেটর বুঝতে পারলেন অল্পের জন্য বুলেটটা তাঁর হৃৎপিণ্ড ভেদ করেনি।

'লা জেরে দ আলজেরি'র একজন সাবেক যোদ্ধা ছিলেন বৃদ্ধ কিউরেটর। তাই ধুঁকে ধুঁকে মরার দৃশ্য অনেকবার চাক্ষুষ করতে হয়েছে তাঁকে।

বড়জোর পনেরো মিনিট, পাকস্থলীর অ্যাসিড ধীরে ধীরে তাঁর বুকের ভেতর ঢুকে পড়বে। পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়তেও খুব একটা সময় নেবে না এই বিষ।

'যন্ত্রণা ভালো, মঁসিয়ে,' বলল আগন্তুক। তারপর সেখানে আর অপেক্ষা করল না, ঘুরে চলে গেল।

একা মেঝের ওপর পড়ে আছেন বৃদ্ধ কিউরেটর। কী মনে হতে আবার লোহার বিশাল গেটের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে তিনি একটা ফাঁদে আটকা পড়েছেন। বিশ মিনিটের আগে এই দরজা খোলা সম্ভব না। এই সময়টুকু পার হয়ে গেলে এখানে যদি কেউ আসেনও, ততক্ষণে আর এই দুনিয়ায় থাকবেন না তিনি।

কিউরেটর কাঁপছেন, নিজের মৃত্যু চাক্ষুষ করার চেয়েও বহুগুণ বেশি অন্য একটা ভয় গ্রাস করে ফেলছে তাঁকে।

গোপন তথ্যটা কাউকে বলে যেতে হবে, যেভাবেই হোক।

বহু কষ্টে দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কল্পনার চোখে ভেসে উঠল তিন ভাইয়ের খুন হওয়ার দৃশ্য। তাঁদের আগের প্রজন্মের কথাও মনে পড়ল তাঁর ... মনে পড়ল সেই মিশনের কথা, যেটার প্রতি তাঁর পূর্বসূরিরা বিশ্বস্ত ছিলেন।

অবিচ্ছিন্ন এক জ্ঞানের শিকল।

সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার পরও প্রতিটি নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে গেছে। এই বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ করেই। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বগোপন তথ্যের একমাত্র মালিক এখন জ্যাক সনিয়ে। তিনি মারা গেলে পৃথিবীবাসীর কেউ কোনোদিন সেই অবিশ্বাস্য সত্যটা জানতে পারবে না।

গ্র্যান্ড গ্যালারির ভেতর ফাঁদে আটকা পড়েছেন তিনি। বিশ্ব চরাচরে এই মুহূর্তে আর মাত্র একজনই আছে, যার কাছে গোপন তথ্যের এই মশালটা দিয়ে যেতে পারেন কিউরেটর।

হঠাৎ কী মনে হতে গ্যালারির ওপরের দেয়ালে তাকালেন সনিয়ে। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো টাঙিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। মনে হলো ছবিগুলো তাঁর দিকে তাকিয়ে পুরোনো বন্ধুর মতো হাসছে।

পেটে তীব্র ব্যথা, তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে শরীরের সব শক্তি এক করলেন সনিয়ে। সামনে অবশ্যপালনীয় যে কাজ রয়েছে, তিনি জানেন, সেটা সম্পূর্ণ করার জন্য বাকি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতে হবে তাঁকে।

১

রবার্ট ল্যাংডন ধীরে ধীরে জেগে উঠছেন।

গাঢ় অন্ধকারে একটা টেলিফোন বাজছে। সংক্ষিপ্ত আর পরিচিত সুর। কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে রেখেছেন। খাটের পাশে রাখা ল্যাম্পের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। আন্দাজমতো হাতটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতেই সুইচ পেয়ে গেলেন। অন করলেন ওটা। আলোকিত হয়ে গেল কামরা। ষোড়শ লুইয়ের আমলের আসবাব, নকশা করা দেয়াল আর চমৎকার কারুকাজসমৃদ্ধ মেহগনি কাঠের বিছানা চোখে পড়ল।

'*আমি কোথায়?*'

বিছানার পাশে একটা বাথরোব দেখলেন ল্যাংডন। ওটার ওপর মনোগ্রাম করা : *হোটেল রিজ প্যারিস।*

ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠছেন তিনি। ফোনের রিসিভার কানে তুললেন। 'হ্যালো?'

'মঁসিয়ে ল্যাংডন?' একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'আশা করি আমি আপনার ঘুম ভাঙাইনি?'

এখনো ঘুমে ঢুলছেন ল্যাংডন, খাটের পাশে নিচু টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার। ১২টা ৩২ মিনিট। ল্যাংডনের মনে পড়ল মাত্র এক ঘণ্টা হয়েছে তিনি ঘুমিয়েছেন। কিন্তু নিজেকে একজন মরা মানুষ বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

'আমি ফ্লোর ম্যানেজার। বিরক্ত করতে হলো বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এক ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন আপনার সঙ্গে, বলছেন খুব জরুরি।'

চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে পারেননি, এখনো একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন ল্যাংডন। দর্শনার্থী? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করলেন। খাটের পাশে, টেবিলের ওপর একটা দোমড়ানো কাগজ দেখতে পেলেন। তাতে লেখা :

দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব প্যারিস

প্রাউডলি প্রেজেন্টস
অ্যান ইভিনিং উইথ রবার্ট ল্যাংডন
প্রফেসর অব রিলিজিয়াস সিম্বোলজি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

লেখাটা পড়ে প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন ল্যাংডন। তাঁর মনে পড়ে গেছে উত্তর ফ্রান্সের শার্ত্রা শহরের একটা গথিক ক্যাথেড্রালে আজ সন্ধ্যায় লেকচার দিয়েছেন তিনি, বিষয় ছিল—পাথরে লুকানো সিম্বোলিজম।

রক্ষণশীল কিছু শ্রোতা হয়তো তাঁর ওই লেকচার পছন্দ করতে পারেননি। সম্ভবত তাঁদের মধ্যে কেউ একজন—খুব ধার্মিক মানুষ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি—পিছু নিয়ে ল্যাংডনের হোটেল পর্যন্ত চলে এসেছেন—বিষয়টা নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা যুদ্ধ না করলেই নয়!

'দুঃখিত,' বললেন ল্যাংডন। 'আমি খুব ক্লান্ত, আর ...'

'মঁসিয়ে,' ল্যাংডনকে বাধা দিয়ে আবার শুরু করলেন ম্যানেজার, ফিসফিস করে কথা বললেও জরুরি ভাবটা লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। 'আপনার দর্শনার্থী একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।'

ম্যানেজারের কথা শুনে সামান্য সন্দেহ হলো ল্যাংডনের। ধর্মীয় চিত্রকল্প আর কাল্ট সিম্বোলজির ওপর বেশ কয়েকটা বই লিখেছেন তিনি। চিত্রকলার জগতে এই বইগুলো রীতিমতো একটা তারকায় পরিণত করেছে তাঁকে। গত বছর ভ্যাটিকানে বহুল আলোচিত এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় তাঁর এই পরিচিতি সহস্র গুণ বেড়ে গেছে। সে সময় মিডিয়াতেও ভালো সাড়া ফেলছিল ব্যাপারটা। তার পর থেকে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ইতিহাসবিদ আর শিল্পবোদ্ধারা তাঁর দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেন। সেই থেকে নতুন এই বিড়ম্বনার হাত থেকে একটা দিনের জন্যও রেহাই পাননি ল্যাংডন।

'যদি কিছু মনে না করেন,' শুরু করলেন তিনি, যতটা সম্ভব নরম সুরে কথা বলছেন, 'আপনি কি ভদ্রলোকের নাম আর টেলিফোন নম্বর কাগজে টুকে রাখবেন? জানাবেন মঙ্গলবার, প্যারিস ছাড়ার আগে, অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি। ধন্যবাদ,' ম্যানেজারকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিলেন।

ইতিমধ্যে উঠে বসেছেন ল্যাংডন। হঠাৎ খাটের পাশে টেবিলে পড়ে থাকা বইয়ের দিকে চোখ গেল। প্রচ্ছদে লেখা—আলোর শহরে ঠিক একটা শিশুর মতো ঘুমান। প্যারিস রিজে বিশ্রাম নিন।

আয়নার দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন ল্যাংডন। যে মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছেন তাঁকে যেন তিনি ঠিক চেনেন না—ম্রিয়মাণ এবং অগোছালো।

তোমার একটা লম্বা ছুটি দরকার, ল্যাংডন।

গত বছর মারাত্মক ধকল গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। কিন্তু আয়নায় সেটার প্রমাণ দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটা কখনো স্বীকার করেননি তিনি, কিংবা বলা যায় গুরুত্ব দেননি। জন্মসূত্রে তীক্ষ্ণ নীল আর উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ পেয়েছেন ল্যাংডন। কিন্তু আজ রাতে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, সেই চোখ দুটোকেই ঠিক চিনতে পারছেন না। ওগুলো যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বোস্টন ম্যাগাজিন যদি এই মুহূর্তে আমাকে দেখত।

গত মাসে ল্যাংডনকে খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয় বোস্টন ম্যাগাজিন। শহরের সবচেয়ে সাড়াজাগানো ১০ জন মানুষের একটা তালিকা তৈরি করা হয়। সেই তালিকায় রাখা হয় ল্যাংডনের নাম। প্রথম থেকেই ব্যাপারটা নিয়ে হার্ভার্ডের সহকর্মীরা তাঁকে ঠাট্টাচ্ছলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে আসছেন। আজ রাতে, নিজের বাড়ি থেকে তিন হাজার মাইল দূরে এসেও বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে তাঁকে।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন ...' আমেরিকান ইউনিভার্সিটি প্যারিস অব প্যাভিলিয়ন ডরফিনের কামরাজুড়ে অসংখ্য শ্রোতার উদ্দেশে বললেন উপস্থাপক। 'আজ রাতে বিশেষ একজন অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আপনাদের। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা বই লিখেছেন তিনি : দ্য সিম্বোলজি অব সিক্রেটস সেক্টস, দ্য আর্ট অব দি ইলুমিনেটি, দ্য লস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অব ইডিওগ্রামস। আমি যদি বলি তিনি ধর্মীয় প্রতীকের ওপর বই লিখেছেন, তাহলে আপনাদের ধরে নিতে হবে কথাটা আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি। ক্লাসে আপনারা অনেকেই তাঁর বই পড়ে থাকবেন।'

হলজুড়ে অসংখ্য ছাত্র উৎসাহের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল।

'আজকে আপনাদের সঙ্গে এই বিশেষ মানুষটির পরিচয় করিয়ে দেব। তবে এক্ষেত্রে তাঁর কারিকুলাম ভাইটার সাহায্য নিতে হবে আমাকে ...' বিরতি নিলেন ভদ্রমহিলা, তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে তাকালেন ল্যাংডনের দিকে। এই মুহূর্তে মঞ্চে বসে আছেন তিনি।

আবার শুরু করলেন ভদ্রমহিলা, 'কিছুক্ষণ আগে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন দারুণ এক জিনিস ধরিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে ... পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে ওটার জুড়ি মেলা ভার।' কথা শেষ করে শ্রোতার দেওয়া 'দারুণ জিনিসটা' উঁচু করে ধরলেন ভদ্রমহিলা। *বোস্টন* ম্যাগাজিনের একটা কপি।

কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেলেন ল্যাংডন। মনে প্রশ্ন—আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সত্যি কি কোনো পথ খোলা নেই?

ল্যাংডন সম্পর্কে বেশ কয়েকটা প্রতিবেদন ছেপেছে *বোস্টন* ম্যাগাজিন। তার মধ্য থেকে বাছাই করা কিছু প্রতিবেদন পড়তে শুরু করলেন ভদ্রমহিলা। ল্যাংডন উপলব্ধি করলেন, প্রতি সেকেন্ডে সিটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

ত্রিশ সেকেন্ড পর দেখা গেল দর্শকরা সবাই হাসছেন। উপস্থাপক যেন থামতে জানেন না। একটা শেষ হতেই আরেকটা নতুন প্রতিবেদনে চলে যাচ্ছেন। ল্যাংডনের ব্যাকুল প্রার্থনা—ভদ্রমহিলাকে কেউ থামিয়ে দিক।

'গত বছর ভ্যাটিকান যে ভূমিকা রেখেছে সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো কথা বলেননি মিস্টার ল্যাংডন। মূলত এজন্যই আমাদের কৌতূহল মাপার মিটারে একটা ভালো পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি,' বলে শ্রোতাদের দিকে তাকালেন উপস্থাপক। 'আরও কিছু শুনতে চান আপনারা?'

দর্শকেরা সবাই একযোগে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

'আমাদের এখনকার তরুণ পুরস্কার বিজয়ীদের মতো প্রফেসর ল্যাংডন হয়তো অতটা হ্যান্ডসাম নন, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে গিয়ে তিনি যতটুকু বলেন, কোনো সন্দেহ নেই, তার চেয়ে আরও অনেক বেশি জানেন তিনি।'

হাসির রোল উঠল।

অনেক কষ্টে এক টুকরো হাসির ব্যবস্থা করতে পারলেন ল্যাংডন। এরপর কী আসবে সেটা তিনি আন্দাজ করতে পারছেন। সিদ্ধান্ত নিলেন এবার তিনি মুখ খুলবেন।

'ধন্যবাদ, মনিকা,' বলে উঠে দাঁড়ালেন ল্যাংডন, তারপর মঞ্চের যেখানে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা কথা বলছিলেন, ঠিক সেই জায়গাটা দখল করে বসলেন। 'ফিকশনের জন্য *বোস্টন* ম্যাগাজিন একটা উপহারের মতো,' বলে শ্রোতাদের উদ্দেশে লাজুক একটু হাসলেন ল্যাংডন। 'এই প্রতিবেদন যিনি দিয়েছেন, যদি খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে ধরে নিন দূতাবাসে গিয়ে তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করব আমি।'

প্রফেসর ল্যাংডনের কথা শুনে আরেকবার হাসির রোল উঠল দর্শকদের মধ্যে।

'কৌতুক করলাম মাত্র,' বললেন প্রফেসর ল্যাংডন। 'আজ রাতে সিম্বলের শক্তি সম্পর্কে কিছু কথা বলব আমি।'

আবার বেজে উঠল ফোন। কামরায় অন্য কোনো শব্দ নেই, আওয়াজটা ল্যাংডনের কানে বিস্ফোরণ ঘটাল। অবিশ্বাসে রীতিমতো গোঙাচ্ছেন, রিসিভার তুলে কানের পাশে নিয়ে এলেন ল্যাংডন। যেমন আন্দাজ করেছিলেন, ফোনটা ফ্লোর ম্যানেজারই করেছেন, 'মিস্টার ল্যাংডন, আবার ক্ষমা চাই। ভদ্রলোক এইমাত্র আপনার কামরার দিকে রওনা হয়েছেন। শুধু এটা জানাবার জন্য আবার আপনাকে বিরক্ত করতে হলো। আমার মনে হয়েছে আপনাকে সতর্ক করা দরকার।'

ল্যাংডন এখন পুরোপুরি সচেতন। 'আপনি আমার কামরায় একজন দর্শনার্থীকে পাঠিয়েছেন?'

'ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই, মঁসিয়ে। কিন্তু তাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণ একজন ... দুঃখিত, তাঁকে বাধা দেব, সে ক্ষমতা আমার নেই।'

'তিনি আসলে কে বলুন তো?' ল্যাংডন প্রশ্নটা করলেন বটে, কিন্তু ম্যানেজার ততক্ষণে ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। আবার রিসিভার রেখে দিলেন ল্যাংডন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নক হলো দরজায়।

অনিশ্চিত একটা ভাব নিয়ে খাট থেকে নামলেন তিনি, উপলব্ধি করলেন পায়ের পাতা কার্পেটে ডেবে যাচ্ছে। ধীরপায়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন তিনি। 'কে?'

'মিস্টার ল্যাংডন? আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি,' গলার স্বরে তীক্ষ্ণ একটা ভাব খেয়াল করলেন ল্যাংডন। 'আমি লেফটেন্যান্ট জোরোমি কোলেত। ডিরেকশন সেন্ট্রাল পুলিশ জুডিশিয়ারি।'